মিশ্র শ্রেণির অবস্থানে আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা : মেমারি - ২ সমষ্টি উন্নয়ন এলাকার তথ্যালোকে একটি বিশ্লেষণ

সাগর মুখার্জী
প্রভাষক, আংশিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, গলসি মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পূর্ব রেলওয়ের একটি স্টেশন মেমারি। বর্ধমান শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২৫ কি.মি। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি রেখা বর্ধমান শহর থেকে টানলে মেমারির উপর দিয়েই রেখাটি বিস্তৃত হবে। খুব সাম্প্রতিক কালে মেমারির পরিচিতি কৃষি পণ্যের বিশাল বাজার হিসাবে।

মেমারিকে দুটি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল মেমারি -১ এবং অপরটি মেমারি-২। ২৩°১০' উত্তর এবং ৮৮°৭' পূর্ব ভূখন্ডে মেমারির অবস্থান। ১০০ বছর আগে এইখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ২ হাজার ছিল। পূর্ব রেলওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই গ্রামটির অবস্থান।

১০০ বছর উর্দ্ধের সময় থেকে মেমারির খ্যাতি ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে। সিল্কের শাড়ি এবং ধূতি এখানে প্রস্তুত করা হত। মেমারি থানাটি স্বাধীন থানা এবং জমি কেনাবেচা নিবন্ধিকরনের জন্য এইখানে একটি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসও আছে। উনবিংশ বিংশ শতকের শেষ থেকে অর্থাৎ বিংশ শতক থেকে, ১০০ বছর পেরিয়েও, মেমারি একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে উপস্থাপন করে।

মেমারি দক্ষিণ বর্ধমানে গড়ে ওঠা সত্ত্বেও, একথা বলতে পারবো না যে এলাকাটি শুধু কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা একটা গঞ্জ শহর। যদিও আরবি শব্দে মামুরী মানে কৃষির স্থান। কৃষির সঙ্গেই সমানতালে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া কৃষিতেও বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এখানে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে। পুঁজিবাদ বিকাশ শুরু হওয়ায় কৃষকদের একটা বড় অংশ সম্পন্ন হয়ে ওঠে আর্থিক দিক থেকে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে পুঁজি লগ্নি করার উপযুক্ত স্থল হিসাবে নির্বাচন করে নেয় এই মেমারিকে। আর্থিক লেনদেনের অনুকূল পরিবেশ এখানে গঠিত হওয়ায় সমগ্র অর্থনীতিটা পুঁজিবাদ অভিমুখী হয়ে যায়।

মেমারি শব্দটি কোথা থেকে এসেছে এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলে মামুড়ি বৃক্ষের পর্যাপ্তির জন্য না কি এর নাম মেমারি হয়েছে, আবার কেউ কেউ মনে করেন মেঘ স্পর্শ করা অর্থাৎ 'মেঘমারী' অট্টালিকা থাকার জন্য এর নাম মেমারি হয়েছে। 'মেঘমারী' অট্টালিকার অবস্থিতি অবশ্য এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় ১২০ বছর আগে থেকে যে অট্টালিকার সন্ধান মেলে সেটি দ্বিতল বাড়ি। যার উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট হবে। এ ধরনের অট্টালিকাকে মেঘমারী বললে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

মেমারি এলাকায় সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা হল বিষয়ী পদবীধারী মানুষেরা। আত্মীয়তা সূত্রে এদের অনেকেরই পদবি এখন লাহা, দাস , দত্ত, গুঁই। জাতিতে এরা তন্তুবায়। মেমারি এলাকার গ্রাম-গঞ্জে এই তন্তুবায় বা তাঁতি সম্প্রদায়ের অবস্থিতি একটা ঐতিহাসিক সত্য কে প্রতিষ্ঠা দেয় সেটি হল প্রাচীন কালে এটি সিল্কের শাড়ি এবং ধূতির বয়নের জন্যে বিখ্যাত ছিল। তাঁত হয়ত প্রায় এখন নেই। কিন্তু বস্ত্র শিল্পের ও বস্ত্র ব্যবসার খ্যাতি মেমারি এখনও বজায় রেখেছে। তন্তুবায় ছাড়াও কায়স্থ জাতি এখানে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। এই কায়স্থগণ স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসাদারদের খাতা লেখার কাজ করত। প্রধানত ঘোষ, বোস এবং দত্ত পদবি এদের ছিল। জমিদারি কাজকর্ম ছাড়াও নানাবিদ চাকুরি এরা করতে ভালোবাসত। এই অঞ্চলের প্রখ্যাত লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়া এদেরই একটি পরিবারের পুত্রবধূ। সংস্কৃতি দিক থেকে এইখানকার সংস্কৃতি মূলত অকৃষি সম্প্রদায়ের প্রভাবাধীনে গড়ে উঠেছে।

ইতিহাসে এমন কিছু প্রমাণ আছে যে, কিছু টাকা সম্বল করে ভাগ্যের অন্বেষণে মেমারিতে এসেছেন এবং এখানে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ ধনী হয়ে গেছে।

কৃষিতো ছিল, যুগপথ এক বিকল্প অর্থনীতির আঁতুরঘর হিসাবে মেমারি আজও পরিচিত। ফলে ম্যাক্রোলেবেলে বা বৃহৎ আঙ্গিনায় মেমারির পরিচয় কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসার সমন্বয় ক্ষেত্র হিসাবে। এইখানকার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলি স্পষ্ট হয়েছে। পারস্পরিক স্বার্থ বিরূপতর দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিও তৈরী হয়েছে।

কৃষ্টিজাত পণ্য ও কৃষি উপকরণের একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র মেমারি। ইংরাজিতে যাকে আমরা 'পেটি বুর্জোয়া' বলি তাদের অভ্যুত্থান এই ব্যবসা কেন্দ্র গুলিকে ধরে।

মেমারির মাটি দোঁয়াশ। এই খানে ধান, আলু, পাট প্রচুর পরিমানে হয়। কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা এই এলাকায় প্রায় ৪০০ বর্গকিলোমিটার ব্যেপে ছড়িয়ে আছে। বহু ব্যবসাদারদের মেমারিতে গদি ও গোডাউন আছে, যেগুলিকে আমরা ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে 'বার্জেস' এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কৃষি জাত পণ্যের ব্যবসাদাররা আবার দ্বৈত চরিত্রের শরিক ছিল। তারা ছিল একই সাথে ক্রেতা ও বিক্রেতা। আলু, ধান, চাল, পাট এরাই কিনতো। আবার খোল, আলুবীজ, ধানবীজ, সার ইত্যাদি কৃষি উপকরণ বিক্রয়ও করতো। একই সাথে তারা কৃষকদের দাদন দিতো এবং ধারে কৃষি উপকরণও দিত। দাদনের জন্য সুদ ছাড়াও কৃষিপণ্য কেনার জন্য আমদানির নিশ্চয়তাও পেতো। এক ত্রিমুখী ব্যবসা চলত। চারের দশক পর্যন্ত মানুষের ঘুম ভাঙত গরুর গাড়ির চাকার আর্ত আওয়াজে। ধান , ঢেঁকিছাঁটা চাল ও অন্যান্য কৃষি বোঝাই গরুর গাড়ির দীর্ঘ সারি মেমারিতে আসা শুরু হয়ে যেতো ভোর থেকে। দাদনে আবদ্ধ থাকায় কোন্ গাড়ি কোন্ গদিতে যাবে তা পূর্ব নির্দিষ্ট থাকলেও কোন গড়বড় যাতে না হয় তার জন্য ব্যবসায়িকদের কর্মচারীরা নজরদারি কোরে। গাড়িগুলিকে নিজ গদিতে নিয়ে আসত। মাল পরিবহনের জন্য লরি বা ট্রাকের ব্যবহার তখনও শুরু হয় নি। লক্ষণগুলি সবটায় কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতির সাপেক্ষ। (কোঙার ঃ পৃ: ২২৮)

কৃষিপণ্যের ব্যবসার সাথে গড়ে উঠেছিল সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের দোকান। কৃষকরা ফসল বেচে অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রী কিনে নিয়ে যেতো। তিনের দশকের মহামন্দায় কৃষকের সর্বনাশ হলেও এই ব্যবসাদার মহাজনদের কোন ক্ষতি হয়নি, তাদের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। অবশ্য সেই সমৃদ্ধি সূত্রটি ছিল আলাদা।

দেনার দায়ে কৃষকদের জমিগুলি মাঠে থাকলেও জমির দলিলগুলি ঢুকেছিল মহাজনদের সিন্দুকে। ব্যবসা দুই ধরনের নিরাপত্তার মধ্যে রমরমা হয়েছিল ১) গ্রামের জমি হকদার তারা, আবার ২) ব্যবসার জিনিসপত্র আমাদানি তাদেরই গুদামে নিশ্চিত । ব্যবসার জন্য পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ছোটাছুটি বা ঘোরাঘুরি এই মহাজনদের করতো হতো না।

পৃথিবীতে একটা বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল ঔপনিবেশিকরা যখন কোন দেশকে নিজেদের আয়ত্বে আনতে চেষ্টা করে, তারা সেই দেশের আমজনতার চেতনা বৃদ্ধি করে, তাদিকে পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার পরিবেশ রচনা করে না। তারা যা করে সেই দেশের মানুষগুলোকে একটা 'বাজারে' পরিণত করে অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে 'মার্কেট' তৈরী করা। বৃটিশ ঔপনিবেশিকবাদ এর ব্যতিক্রম ছিল না। যে সব বাণিজ্যের আখড়াগুলো মেমারিতে গড়ে উঠেছিল, আয়তনে সেইগুলি ছিল খুবই ছোটো হোলেও এই রকম দাঁড়িয়েছিল-গ্রামে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি প্রথাগত হয়ে যেমন চলছিল তেমনি চলে যায়। তার উপরে কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে একটা ধনী লোক শ্রেণি প্রতিপত্তি অর্জন করে। ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করেছি এই পেটি বুর্জোয়াদের অবস্থান কৃষি বিপ্লবের সঠিক পরিপোষক পরিবেশ রচনা করতে পারে নাই। বরং উল্টো এক প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে ডানা বাঁধে। ঠিক ঔপনিবেশিকবাদের অনুরূপ পরিমন্ডলী গড়ে ওঠে। যার অর্থ সামগ্রিক জনতার কল্যাণ নয়, জনতাসৃষ্ট সম্পদকে নিয়ে একটা বাজার অর্থনীতির ধারা তৈরী করা। মেমারি এলাকায় এই বৈশিষ্ট্যের এক বাস্তব প্রতিছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক শোষণটি এবং শোষনের ধারাটি বুঝতে গেলে একটি বিশেষ সামাজিক মনস্তত্ত্ব সর্ম্পকে ধারণা থাকা দরকার। অবশ্য এই সামাজিক মনস্তত্ত্বটি ব্যক্তি মনস্তত্ত্বেরই প্রতিফলন। রূপরেখাটি হল- ব্যক্তি মানুষ তার নিজস্ব চাহিদা অনুসারে, সে চাহিদাটি বিকৃত হোক বা সঠিক হোক, বাহ্যিক প্রকৃতি, জিনিস এবং মানুষকে ব্যবহার করতে চায়। এরজন্য যুগে যুগে অনেক রোমহর্ষক আচরণ করে গেছে সে। সবই ঘটেছে নিজের ব্যক্তিগত ভাবনা অনুসারে। প্রাকৃতিক জিনিস, এমনকি দেব-দেবীর ভাবনাও, তাদের কল্পিত মূর্ত্তি প্রভৃতি সব কিছুই সে চেহারা দিয়েছে নিজের ভাবনা অনুসারে। ব্যক্তি মানুষের এই ধরণের আচরণের সামাজিক প্রকাশ আমরা ঔপনিবেশিকবাদের সুবিধা ভোগী শ্রেণির মধ্যে খুব নিষ্ঠুর ভাবে প্রকাশ হতে দেখি। শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সুবিধা ভোগী শ্রেণি দুর্বল শ্রেণি গুলিকে চরম ভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। দুর্বল শ্রেণির বিকাশের বিষযটিকে কোন ভাবেই তারা পাত্তা দেয়নি, বরং মানুষকে একটি উপকরণের সমতুল্য ভেবে নিয়ে তাদিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

বলা বাহুল্য, সার্বজনীন কল্যাণ আর ব্যক্তি বা শ্রেণি স্বার্থের বিষয়-দুই মেরুতে অবস্থান করে, যদিও এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সার্বজনীন কল্যাণের ভাবনায় ব্যক্তি বা শ্রেণি স্বার্থ ওতোপোতো ভাবে জড়িত। সার্বজনীন কল্যাণ হলে ব্যক্তি বা শ্রেণির কল্যাণও সুনিশ্চিত হয়। মানুষের ভাবনার মধ্যে এটা একটা বড় 'Fallcy' যে, তারা ধারণা করে ব্যক্তি স্বার্থ বা শ্রেণি স্বার্থের মধ্যে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ঘটবে। সেই Fallcy অতীতে ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে, কারণ মানবিক ভাবনায় পশু প্রেরণা প্রায় সার্বজনীন ভাবেই এখনও টিকে আছে।

মেমারী-২ ব্লকে অধিবাসীগণের বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে এলাকাটির সঠিক আর্থ সামাজিক অবস্থানকে আমরা নিরূপন করতে পারি। এইখানকার অধিবাসীদের মোট সংখ্যা হল ১,৩৫,৬৭১ জন। এই জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ মানুষ শ্রমিক। যার অর্থ এই ৪১ শতাংশ মানুষের জীবিকার আসল মূলধন তাদের 'কায়িক পরিশ্রম'। শ্রমিক শ্রেণির আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যেমন খেতমজুর, কুটির শিল্প এবং অন্যান্য। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ট হল খেতমজুর (৫৩.৯২ শতাংশ)। কুটির শিল্প নির্ভর শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম মাত্র ২.০৯ শতাংশ। অন্যান্য শ্রমিক বলতে আমরা যাদিকে বুঝি যারা যে কোন কাজে কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নিবাহ করে। এদের পরিমান মোট শ্রমিকের ২৪.১২ শতাংশ। (সরণী - ১,২)

খুব খুঁটিয়ে বিবেচনা করলে বোঝা যাবে কৃষিকে অবলম্বণ করে যে শ্রমিক কুল বেঁচে আছে তারা তাদের জীবিকার হয়ত একটা স্থায়ী নোঙ্গর ফেলতে পেরেছে। অন্যান্য শ্রমিক বলে যাদিকে অভিহিত করা হচ্ছে জীবিকার দিকে তারা কিন্তু যাযাবর অর্থাৎ কখন কি কাজ পাবে তার স্থিরতা নেয়। এই অনির্ধারিত বৃত্তির উপর নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণীর ১/৪ অংশ বেঁচে আছে। সামাজিক তাৎপর্যে এদের অস্তিত্ব কতটা কল্যাণ কর তা বিবেচনা করতে হয়।

যদি আমরা মেমারী -২ এলাকায় সমাজ নৈতিকতা বিষয়টিকে পর্যালোচনা করি তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে সামাজিক অপরাধ প্রবণতা এই অনির্ধারিত বৃত্তি ভোগীদের মধ্যতেই বিরাজ করছে। গ্রাম যে সুস্থির অর্থনীতির ভিত্তিতে দিনযাপন করে এই সত্যটি কিন্তু বানচাল হয়ে যায় এই বৃহৎ সংখ্যায় অর্নিধারিত বৃত্তি ভোগীদের অবস্থানের পরিপেক্ষিতে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই শ্রেণির মানুষেরা গ্রামীণ জীবনে হতাশায় ভোগে এবং প্রয়োজনে শহরাভিমুখে গমন করে এবং সেইখানে বস্তির এলাকার লোক সংখ্যাকে বাড়িয়ে তোলে। ১/৪ অংশ কর্মজীবী মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন হয়ে গেলে সামাজিক ভারসাম্য যে কোন দিকে টোলবে এটা বলা যায় না।

এবারে আসা যাক অন্য কথায়, মেমারী -২ এলাকাটি কৃষি প্রধান এলাকা। কৃষকদের সংখ্যাই এইখানে জনসংখ্যার আসল সংখ্যা। কৃষকদের উপরেই তাদের কল্যাণ নির্ভর করছে। কিন্তু এটাও ভেবে দেখা দরকার যে উদ্ধৃত্ত জনগণকে কর্মমুখী করতে হলে তাদের বিকল্প আয়ের উৎসকে সৃষ্টি করতে হবে। যার অর্থ কৃষির সঙ্গে শিল্পেরও

প্রয়োজন। শিল্পটি কুটির শিল্প বা ভারী শিল্প যাই হোক। সেটা কে বাড়ানো দরকার। উদ্বৃত্ত ভেসে বেড়ানো মানুষ গুলোকে কর্মমুখী করার উদ্দেশ্যে। একবিংশ শতকের প্রথমেই যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এতদএলাকার ভারী শিল্প তো নেই, কুটির শিল্প যা আছে তা ছিটে-ফোঁটা। ২.০৯ শতাংশ মানুষ কুটির শিল্পে নিযুক্ত। সুসংহত অর্থনীতির মাপকাঠিতে এহেন চিত্র ভীষণ অস্বাস্থ্যকর। এমন নয় যে, কৃষি সহায়ক হিসাবে অথবা কৃষি উৎপাদিত পন্যগুলিকে নিয়ে কুটির শিল্প গড়া যেতো না। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুকে কে নিয়েই কুটির শিল্প গড়ে উঠে নাই স্বাধীনতা ৬৮ বছর পরেও । এক্ষেত্রে গ্রামীণ শাসন পরিচালনার কর্মকর্তাদের বিশিষ্ট্য ভূমিকা ছিল যেটি পালনে ব্যর্থ হয়েছে গ্রামীণ প্রশাসকবৃন্দ। ঐ একই কারণে অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের অর্থনীতির বাইরে হয়ত কোন ব্যক্তি অগ্রবর্তী ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে নাই। নিতান্ত ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়।

মেমারী - ২ ব্লকে কৃষকদের মধ্যে প্রায় ৫টি শ্রেণি পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণিটির জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের নিচে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৬৯৪৪৩। ১ হেক্টর থেকে ২ হেক্টর মধ্যে রায়তের সংখ্যা ১১৬। ২ হেক্টর থেকে ৪ হেক্টর মধ্যে রায়তর সংখ্যা ১৫। ৪ হেক্টর থেকে ১০ হেক্টর মধ্যে রায়তের সংখ্যা ৭ জন। ১০ হেক্টর উর্দ্ধে ৬জন। (সরণী ৩)

পরিসংখ্যান গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মেমারি - ২ব্লকের প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এমনকি এলাকায় কৃষি অর্থনীতিটি একমাত্র প্রান্তিক কৃষকদের উপরেই নির্ভর করে গড়ে উঠছে। প্রান্তিক কৃষকেরা যেটুকু জমি পেয়েছে তার পরিমাণ গ্রামের কথা কথায় ৫ থেকে ৬ বিঘার বেশি নয়। আর এই ৫-৬ বিঘা জমি চাষ করে একজন মানুষ তার পরিবারকে প্রতিপালন করতে কোন ক্রমেই সক্ষম হয় না। কারণ বিঘা প্রতি নিট আয় কোন কৃষকই প্রায় ১৫০০ টাকার বেশি পায় না। যদি জমির পরিমাণ ৫ বিঘা হয় তাহলে বাৎসরিক আয় দাঁড়াবে মোটামুটি ৭৫০০ টাকা। এক ফসলী জমি চাষ করে একটা মানুষ মাসে প্রায় ৭০০-৮০০ টাকার বেশি উপার্জন করতে পারে না। পরিবারে যদি ৩ জন লোক থাকে তাহলে মাথাপিছু আয় হয় প্রায় ২০০-৩০০ টাকার মধ্যে। এই ২০০-৩০০ টাকা মাসিক আয়ে কোন মানুষ বেঁচেই থাকতে পারে না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রান্তিক চাষি দের বিকল্প আয়ের সন্ধান করতে হয়। বিকল্প আয়ের সন্ধান করতে গিয়ে এই প্রান্তিক চাষিকে কৃষি ছাড়াও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। পরিণাম হয় তার নিজস্ব কৃষি ক্ষেত্রে এবং তার উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে উৎকর্ষের অভাব বা গুনগত মানের অভাব। আধুনিক তত্ত্বে যেটাকে আমরা 'নিবিড় চাষ' বলে অভিহিত করতে পারি তার দর্শন থেকে এই প্রান্তিক কৃষক সরে আসতে বাধ্য হয়। সামগ্রিক প্রভাবটা এসে যায় পুরো কৃষি অর্থনীতির উপর অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রটি উত্তরোত্তর উৎকর্ষতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে যায়। জাতীয় নীতি যতই ভালো থাকুক ভূমিস্তরে প্রান্তিক কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গি তেমন রদল বদল সম্ভব হয় না। তাই আমরা কৃষির দ্রুতবিকাশে খামতি আমার এখন লক্ষ্য করি।

সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক বিচারে মেমারী - ২ সমষ্টি উন্নয়ন এলাকাটির মানুষের শুধু মাত্র জীবন যাপনের সংগ্রামেরই ব্যস্ত থাকে বলে মনে হয়। একটা মানুষ অথবা এটা জাতি বা গোষ্ঠী শুধু মাত্র পেটের ভাত আর লজ্জার বস্ত্র সংগ্রহ করতে যদি সব সময় ব্যস্ত থাকে তাহলে তার সৃজনশীলতা বা সাংস্কৃতিক মনস্কতা আদৌও বেড়ে ওঠে না। ফলে এই মানুষ গুলো অত্যাধিক বিষয়ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। ছোটোখাটো লাভ-লোকসান, পাওয়ানা-দেনা হিসাব করতে করতে তাদের জীবন অতীষ্ট হয়ে যায়। এমন কি বৈষয়িক কারণে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । সমাজ হল সমান কম্পন অনুভূত মানুষদের সমাবেশ। নিত্য-নিয়মিত বিবাদ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব গোষ্ঠীকে নিম্নাভিমুখে টেনে নামায়। কল্যাণকর রাষ্ট্রের বহু জনের কল্যাণের ধারণাটি তাদের কাছে অবান্তর হয়ে পড়ে একটা অস্বাস্থ্যকর সামাজিক বোধ সকলকে গ্রাস করে ফেলে। এই অবস্থায় ভালো কাজের কথা, যৌথ আন্দোলন বা বিপ্লবের কথা সবই অর্থহীন হয়ে যায়। শুধু কৃষকসভা বলে নয় যে কোন প্রকার যৌথ উদ্যোগ শুধুমাত্র কল্পনা জগতে

স্থান নেয়, বাস্তব বিকাশের আঙ্গিনায় তার প্রতিফলন ঘটে না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বড় কথা, বড় পরিকল্পনা কোন ক্রমেই অগ্রবর্তী অবস্থানে আসতে পারে না। বাংলার বুকে সম্ভব্যত: এটাই বড় অভিশাপ।

শ্রেণি যাই হোক তার পটভূমিতে যদি অত্যাধিক বিষয়প্রিয়তা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে পরিণামে ইউরোপের জার্মানির অনুরূপ আর্থিক অবস্থা দাঁড়াবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন ভাবে জার্মানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছিল এবং লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে দেশত্যাগি হতে বাধ্য করেছিল সেই রকম এক ভয়াভহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে আগামী দিনে এই গোষ্ঠীগুলির জন্য। ভারতীয় বামপন্থীরা এই সামাজিক ব্যাধির প্রকোপ কে রোধ করতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।

তপসিলী উপজাতির সংখ্যা এই এলাকায় বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৯৩৫ জন হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই তপসিলী উপজাতির মানুষেরা এখানে নতুন এসেছে। এদের আগমন ঘটেছে মূলত কৃষি শ্রমিক হিসাবে। খেত খামারে কাজ করে এরা নিজের দেশে ফিরে যায়নি এই এলাকাতেই থেকে গেছে। সমস্যা হয়েছে উপজাতি বনাম অন্য উপজাতির সর্ম্পকটা কে নিয়ে। লক্ষ্য করা গেছে উপজাতির মানুষেরা ধীরে ধীরে নিজেদের সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলতে বসেছে। অন-উপজাতিদের যেসব বদঅভ্যাস সেই গুলি বেশি গ্রহণ করছে। তাছাড়া শিক্ষার তাগিদ থাকলেও অন্য উপজাতিদের সাথে একই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে হতাশা গ্রস্থ হচ্ছে। খুব বড় জোর মাধ্যমিক পর্যন্ত । তার পর তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নানা বৃত্তির সন্ধানে ছোটা ছুটি করছে। এই বিদ্যালয় ছুট ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ। ভারত সরকারের শিক্ষা পরিসংখ্যানে এটা বহুদিনে প্রতিষ্ঠিত। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে রাবিন্দ্রীক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করায় সেই সমস্ত বই সঠিক ভাবে উপজাতির ছেলে মেয়েরা রপ্ত করতে অপারগ হচ্ছে। এমন কি শব্দগুলোকেও সঠিক ভাবে বুঝতে অক্ষম হচ্ছে। সমস্যাটা সমাধান তো হয় নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রাম গুলিকে দেখে খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারা যায় সমস্যাটির গভীরতা কতদূর। পরিবর্তন আগে হয়েছে এবং বর্তমান কিছু পরিমাণে হচ্ছে। কিন্তু আসল সমস্যাটি কে বাদ দিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় গ্রামীণ প্রশাসন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসিন। (সরণী - ৪)

এখানে মনে রাখা দরকরা যে ঘটনাটি শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের নয়। এটা সর্ব ভারতব্যাপী এবং সরকারী ভাবে স্বীকৃত বটে। ১৯৬০ - ৬৫ বা ছয়ের দশকে জাতীয় স্তরের প্রতিবেদনে এই ধরণের প্রতিফলন আখচার। মনীষীদের লেখাতেও বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয়েছে। স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে স্বাধীন ভারতে নাগরিকদের মধ্যে যৌথ অথবা গোষ্ঠী বদ্ধ সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক ভিত্তিটির প্রতি আর তেমন শ্রদ্ধা নেই এমন কি অন-উপজাতি সভ্য মানুষদের ও নগরপরায়ণতা কে নিজেদের জীবনের অন্যতম উপজীব্য বলে মনেই করে না। শুধু তাই নয় মহাকালের যাত্রাপথে চলতে গিয়ে নতুন ভারতের মানুষেরা প্রতিপদে মানব আত্মার অবমাননা করছে। এখনও রাজনীতি আর অর্থনীতির মধ্যে একটা দুবৃত্তায়ন ঘটে গেছে। মানুষ যেকোন ভাবেই হোক ক্ষমতা কে মুষ্টিবদ্ধ করতে চাইছে। চারিদিকে একটা নতুন ধরণের ঔপনিবেশিকবাদ দেখা দিয়েছে। (সেন : পৃ -২৭,২৮)

নতুন ভারতের নাগরিকগন যুথ জীবনের পবিত্রতা ও নগরপরয়ণতার সৃজনশীলতার প্রায় সবই হারিয়ে ফেলেছে। ছোটো ছোটো কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর এক ধরণের শোষণ মনোভাবসম্পন্ন হয়ে অন্য গোষ্ঠীকে, বিশেষ করে দুর্বল গোষ্ঠীকে, দাবিয়ে রাখছে। স্বায়ত্বশাসনের যুগে অতীত জনজাতিগুলোকে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু অর্থলোভ ছড়িয়ে দিয়ে এক ধরণের বিশেষ নেতৃত্ব সৃষ্টি করেছে। পরিণামে যা হচ্ছে, কিছু রাস্তা ঘাট বা ঘরবাড়ি হলেও, বৌদ্ধিক ক্রিয়া কলাপে মানুষগুলো অত্যন্ত নিচুমানের হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় মধ্যযুগের বর্বরতা প্রকাশ পাচ্ছে।

যে পর্যবেক্ষণের নিরিখে উপরিধারণাটি নথিভুক্ত করা হল। এই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ছয়ে দশকের যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি পদ অলংকৃত করেছিলেন এবং পৃথিবীর অন্যতম দার্শনিক ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ। তাঁর পর্যবেক্ষণ টি ঘটেছিল ছয়ের দশকে। আজ নয়। স্বাভাবিক ভাবেই অবক্ষয় যদি কিছু হয়ে থাকে তা ভারত স্বাধীন হবার পরেই। যে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতীয়রা সংগ্রাম করলো সেই ঔপনিবেশিকের মনোভাব নিয়েই আমরা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বদ্ধ হয়ে আভ্যন্তরীন ঔপনিবেশিকতা কে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে দূর্বল শ্রেণিকে পর্যদুস্ত করে ফেলছি। বিদগ্ধ মানুষদের এটায় হল আধুনিক কালে সিদ্ধান্ত।

সরণী ১

ব্লক	মোট শ্রমিক		মোট জনসংখ্যা
	সংখ্যা	শতকরা	
মেমারী -২	৫৫৬২২	৪১	১৩৫৬৭১

উৎস সেনসাস রিপোর্ট - ২০০১

সরণী ৩

মেমারী ২ ব্লক জমির শ্রেণী বিভাজন

পরিমাপ	রায়তের সংখ্যা	জমির পরিমাপ
১ হেক্টরের নিচে (.০০১ - ২.৪ একর)	১৬৯৪৩৩	২১৮.১৪৫৫একর
১ হেক্টর থেকে ২ হেক্টর (২.৪১ থেকে ৪.৮ একর)	১১৬	৩.২৭০০ একর
২ হেক্টর থেকে ৪ হেক্টর (৪.৮১ থেকে ৯.৬ একর)	১৫	৬.০০০০ একর
৪ হেক্টর থেকে ১০ হেক্টর (৯.৬১ থেকে ২৪ একর)	৭	১০.৮১০০ একর
১০ হেক্টরের উর্দ্ধে (২৪.১একরের বেশি)	৬	৫৬.০০০০ একর

উৎস

বর্ধমান জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার করন

সরণী ২

ব্লক	কৃষক		কৃষি শ্রমিক বা খেত মজুর		কৃটির শিল্প		অন্যান্য শ্রমিক		মূল শ্রমিক		প্রান্তিক শ্রমিক		শ্রমিক ছাড়া		মোট শ্রমিক
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	
মেমারী -২	১১০৫৪	১৯.৮৭	২৯৯৪৯	৫৩.৯২	১১৬৪	২.০৯	১৩৪১৫	২৪.১২	৪০১৮৯	২৯.৬২	১৫৪৩৩	১১.৩৮	৮০০৪৯	৫৯	৫৫৬২২

উৎস সেনসাস রিপোর্ট - ২০০১

সরণী ৪

তপসিলী উপজাতি

পুরুষ	মহিলা	মোট
১২৯৬৯	১২৭৬৬	২৫৯৩৫

উৎস সেনসাস রিপোর্ট - ২০০১

তথ্যসূত্র :

১. কোঙার , বিনয়। 'গঞ্জ–শহর মেমারি : গড়ে ওঠার রূপরেখা', নতুন চিঠি, শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮।

২. ঘোষ, বিনয়। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', খন্ড ৩-৪ , কলকাতা, ১৯৭৬।

৩. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি। 'বর্ধমান জেলার ইতিহাসও লোক সংস্কৃতি', খন্ড, র‍্যাডিক্যাল, ২০০১।

৪. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি', খন্ড ২-৩, কলকাতা, ১৯৯৪।

৫. মন্ডল, ঋষিগোপাল। 'বর্ধমান জেলার গ্রাম সমষ্টি : মেমারি-১', লোকভারতী, নবপর্যায়ের চতুর্থবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৫।

৬. সরকার, দেবপ্রসাদ। 'মেমারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', সুপ্রিম পাবলিসার্স, কলকাতা, ২০০১।

৭. সেন, সুকুমার। 'বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা', ১৯৭৪।

৮. সেন, পৃথ্বিরাজ। 'ভারতরত্ন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ', বিশ্বনাথ বুক স্টল, কলকাতা, ১৪২১ ভাদ্র।

৯. Peterson, J.C.K. 'Bengal District Gazetteers, Burdwan' , 1997.